দৈনিক সংবাদ

T.A.

তারিখ 15 APR 1986

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

সময়

075

ভাত-খাওয়া দিয়ে সুনাম করাটাকে যথেষ্ট বলতে পারি না, হুজুগ ও হুজ্জতের দিকটাও উল্লেখ করতে হয়। তাছাড়া ভাত তো এখন অনেক বাঙ্গালী খায়ও না, কেউ খায় না পায়না বলে, আর কেউ (অল্পই অবশ্য) খায় না আরো ভালো খাবার পাচ্ছে বলে। তাই সৌভাগ্য বলতে হবে যে, হুজুগ ও হুজ্জত এখনো বাঙালীর চরিত্র থেকে মুছে যায়নি। হুজ্জত মানে তো অভিধানে দেখলাম তর্ক, কলহ, গোলমাল। তাতেই যা একটু সংশয়ে পড়া। কেননা ওই তর্ক, কলহ, গোলমাল, বিশেষ করে গোলমাল কি সকলে উচিত মতো করতে পারে? করার জন্য একটা জোর চাই তো, নৈতিক না থাকুক, দৈহিক বলতো থাকতে হবে। হুজ্জত কি তাহলে জাতীয় চরিত্র থেকে মুছে যাবে? বাঙালীকে আর হাড় হুজ্জতে বলা যাবে না?

ভেবে দেখেছি এ আশঙ্কা অত্যন্ত অমূলক। কেননা শক্তিমানরা এদেশে থাকবেনই। যেমন থাকবে একটি শাসকশ্রেণী। আগের ছিল। আগে ইংরেজ শাসন করতো, পরে পাকিস্তানীরা এলো। এই শাসকেরা হুজ্জত করেনি তা কি বলতে পারবো? আসলে, বাঙালী-অবাঙালী নয়, শাসক হলেই হলো। হ্যাণ্ডেল পেলেই লোকে যেমন ভাবে দিই একটা মোচড় দিয়ে, ক্ষমতা পেলেও বোধকরি তেমনিভাবে, নিই একটু হুজ্জত করে। হতে পারে বাঙালী একটু বেশীই করে, যেমন মাছরাঙা একটু বেশী মাছ খায়। কত বেশী, কিম্বা আদৌ হুজ্জতে কি না সেই তর্কে প্রবেশ করবার কোনো প্রকার ইচ্ছে আমার নেই এই মুহূর্তে; তবে, হ্যাঁ, এটা আমি বলতে বাধ্য যে, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের ব্যাপারটাতে হুজ্জতের ব্যাপার আছে বলে যে সন্দেহটা ওঠেছে সেটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে শিক্ষকেরা যখন দিনের পর দিন বিরত থাকছেন কর্ম থেকে, সভা ও শোভাযাত্রা করছেন পথে পথে, জেলেও গিয়েছিলেন কেউ কেউ, যদিও এখন ছাড়া পেয়েছেন। এবং উড়িয়ে দেওয়া এজন্যও যাচ্ছে না যে, কেবল শিক্ষকরাই ভুগছেন না, নিজ নিজ ঘরে স্কুলবিহীন ছেলে-মেয়েদেরকে সামলাতে গিয়ে অনেক পিতা-মাতারই হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই সঙ্কটের নিরসন কবে হবে আমরা জানি না। মনে হয় কেউ জানেন না। জানাজানির ব্যাপারে মোটেই নিশ্চিত হবার উপায় নেই, শেষবারের পরও নির্বাচনের তারিখ যখন আরো একবার পেছালো।

সরকার অবশ্য দাবী করছেন যে, তারা শিক্ষকদের প্রতি যথার্থ 'সদিচ্ছার' প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে গ্রেফতার করা শিক্ষকদের অনেককাল আটক রাখতে পারতেন, তা রাখেননি, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছেন যে, শিক্ষকদেরকে তাঁরা সর্বোচ্চ সম্মান দেন। শিক্ষকদেরকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে এবং কাউকে কাউকে জেলে পাঠিয়ে সেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে কি না আমরা জানি না, কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। সদিচ্ছা ও সম্মানের অতিরেকের তাড়াতেই কি না জানি না, শিক্ষকরা সনে হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁরা স্কুলে ফেরত যাচ্ছেন না। ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছেন।

সরকার বলছেন, শিক্ষকদের দাবী মানা যায় না। টাকার সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। সেটা আমরা বুঝি। টাকাই যদি থাকবে তাহলে এতো বেশী লোক আমরা এতো বেশী দরিদ্র হয়ে সারা বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করবো কেন? তবে একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে। সেটি এই যে, অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে যেখানে টাকা কোন সমস্যাই নয়। অঢেল ঢালা হচ্ছে। নিয়ম এই যে, খাত যত বেশী অনুৎপাদক তাতে তত বেশী টাকা খরচ। এবং যত বেশী অনুৎপাদক তত বেশী মর্যাদা। শিক্ষাখাতে যেহেতু পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নেই, এবং তার মর্যাদাও তেমন নেই তাই লোকের মনে এই সন্দেহ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে, শিক্ষা বোধহয় সত্যি সত্যি একটি উৎপাদক খাত বটে।

এটা অবশ্য আমরা ছাড়া পৃথিবীর অন্য সবাই ইতিমধ্যে মোটামুটি টের পেয়ে গেছে। তেল পেয়ে গিয়ে হঠাৎ সাংঘাতিক রকমের বড় লোক হয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ, দেখা যাচ্ছে তারাও দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষকদের নিয়ে গিয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে দ্রুত শিক্ষাদানের আয়োজন করেছে। এমনকি আমরা যে আমরা তাদের কাছ থেকেও শিক্ষকদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তারা। ওদিকে আমাদের নিজেদের শিক্ষার যে এঁড়ে বাছুরটি শতকরা ২০-২২ ভাগে পা গেড়ে বসে আছে, কিছুতেই নড়বে না, তার কাছে মনে হয় কর্তৃপক্ষের সমস্ত উদ্যম ও শুভ ইচ্ছা আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। এদেশে যারা শিক্ষক হন বড় দুঃখ নিয়েই হন, সম্মান আশা করেন না, কিন্তু এখন যেভাবে তাদের অসম্মান ঘটানো হচ্ছে তার নজির আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের বইতেও খুব বেশী আছে বলে ধারণা হয় না। জেল-জুলুম তো আছেই, যে ভাষায় হুমকি আসছে তাতে শিক্ষকদের সম্মানের ভগ্নাবশেষটুকুও ভুলুণ্ঠিত হবার যোগাড়। শিক্ষকদের অসম্মানিত করে শিক্ষার সম্মান বৃদ্ধি করা যাবে একথা ভাবা আর মানুষ মেরে মনুষ্যত্ব রক্ষা করার চেষ্টা একই রকমের কাজ আসলে।

এরি মধ্যে এস, এস, সি পরীক্ষা হয়ে গেলো। অন্ততঃ এক্ষেত্রে যে হুজ্জতের ব্যাপার ঘটেছে তাতে কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ দেখি না। সরকার বললেন, যে-কোনো মূল্যে পরীক্ষা নেবেন। জবাবে শিক্ষকরা কিন্তু বলেননি যে, যে-কোনো মূল্যে তারা পরীক্ষা হতে দেবেন না, বরঞ্চ বলেছেন যে, তাঁদের দাবীর দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার যাতে করে তাঁরা পরীক্ষার কাজে যোগ দিতে পারেন। পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন উঠেছে, কি ধরনের পরীক্ষা হলো এটা? নকল জিনিসটা অর্বাচীন নয়, আগেও হয়েছে, কিন্তু এ হারে তো আগে কখনো হয়নি। বায়াত্তর সালের পরীক্ষার সঙ্গে এর তুলনা শুরু হয়ে গেছে। সেই সময়ে যুদ্ধের ফলে দেশে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। যে কেউ এসে পরীক্ষা দিয়ে গেছে। না, তা নয়। যে কেউ দিতে পারেনি। 'সংবাদ'-এ একজন পত্রলেখক ঠিকই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, একাত্তর সালের বাতিল করা পরীক্ষায় সেও হুজ্জতের পরীক্ষা ছিল একটা, যারা পরীক্ষার্থী ছিল তারাই কেবল পরীক্ষা দিতে পেরেছে বাহাত্তরে, যে-সে নয়। এবারের পরীক্ষায় এডমিট কার্ড পায়নি এই অজুহাতে টুকিটাকি কাগজপত্র দেখিয়ে অনেক নকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে গেছে বলে অভিযোগ আছে। তাছাড়া, নকলের তো কোনো মা-বাপ ছিল না। একজনের উত্তর আরেক জনের লিখে দেওয়া থেকে শুরু করে বাইরে থেকে উত্তর লিখে সাপ্লাই দেয়া

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 APR 1986

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

বহিয়া যায়

গাছপাথর

পর্যন্ত সবকিছুই প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলেছে। বোকার মতো কেউকেউ বাধা দিতে গেছেন ফলে হাঙ্গামা বেধেছে, গোলাগুলি হয়েছে, লোকও মারা গেছে। বোকার মতো বললাম এই জন্য যে, এরা এবারের পরীক্ষার মূল দর্শনটা ধরতে পারেননি। দর্শনটা ছিল, যে-কোন মূল্যে পরীক্ষা নেওয়া এবং শিক্ষকদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া! এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের কো-অপারেশন প্রয়োজন ছিল। ঢাললেই হলো, পানি ঢালছে না দুধ ঢালছে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়। ছিল না।

কিন্তু কোন্ মূল্যে? বায়াত্তরের সেই ফাঁকটাইতো এখনো আমরা ভরাট করতে পারিনি। দালান ওপরে উঠে গেছে, ভেতরে একটা জায়গায় গাঁথুনিটা কাঁচা। এবার আবার নতুন একটা ফাঁকের সৃষ্টি হলো। এর মূল্য কে যোগাবে অবশ্যই তাঁরা যোগাবেন না যাঁরা ক্ষমতাবান। যাঁদের বিত্ত আছে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা এই সমস্ত আজেবাজে পরীক্ষা-টরীক্ষা আর দেয় না। বিদেশী সিষ্টেমে শিক্ষিত হচ্ছে, সময় মতো বিদেশে চলে যাবে। প্রাকৃত ভাষায় বললে পাগার পার হবে। ভুগবে নিরুপায় দেশবাসী। ফার্স? ফার্সতো লোকে দূর থেকে দেখে দেখে আমোদ পায়। এটা ফার্স হবে কোন্ দুঃখে? এতো একটি ট্র্যাজেডি, সেই ট্র্যাজেডি যাতে আমরা দর্শক নই, ভুক্তভোগী। এর যা মূল্য তা আমাদেরকেই দিতে হবে।

শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষা বড়—এটা আমাদের জন্য একটি পুরোনো ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। ইংরেজরাই এর প্রতিষ্ঠাতা। তারা এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় খোলে শিক্ষা দেবার জন্য নয়, পরীক্ষা নেবার জন্য। বলতে পারি দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল ঔপনিবেশিক। সেটাই স্বাভাবিক ছিল তাদের জন্য। তারা এদেশের মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য আসেনি লুণ্ঠন করবার জন্য এসেছিল সেই কাজে সাহায্য করবার জন্য কিছু লোক দরকার ছিল আর ওই লোকদেরকে বেছে নেবার জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ওই একই ব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান, এখনো শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষাই বড়। এর কারণ এখন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দেশে গড়ে উঠেছে তারও দৃষ্টিভঙ্গী একই। তুমি কিভাবে লেখাপড়া করছো তা আমার দেখার ব্যাপার নয়, পারলে পড়ো, না পারলে হাওয়া খাও, আমি দেখবো—তুমি আমার কাজে লাগবে কিনা